মায়ের ভাষা বাংলা

মোছাঃ আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ায় রক্ত মাখলো
দুঃখের মাস একুশ এলো
শিমুল-পলাশের ডালে কোকিল ডাকলো
রক্তঝরা একুশ এলো।
মায়ের কোল খালি হলো
বাবার বুকে বাষ্প জমলো
থোকায় থোকায় একুশ এলো।
মা খোঁজে ওহি (ওহিউল্লাহ) কোথায় গেলো
ওহির খোঁজে বন্ধুরা ছুটলো,
রক্তে মাখা দশ বছরের ওহি মিললো
রক্তের ভেলায় চড়ে একুশ এলো।
সালাম-বরকত রক্তে ভাসলো,
দুঃখের স্মৃতিতে একুশ এলো।
মিটিং হলো, মিছিল হলো
দেশের মানুষ কিছু না মানলো।
রক্তজবায় একুশ এলো,
মিছিলে ওরা গুলি চালালো,
ট্রাক ভরে লাশ উঠালো,
কোথায় সেসব গুম করলো?
কান্নায় কান্নায় একুশ এলো।
রফিক-জব্বার রয়েছে বুকের গভীরে
মায়ের ভাষা বাংলা সবার মুখেরে।

জীবন

মোছাঃ আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

ঘাসের ডগায় শরতের শিশিরবিন্দু,
কাশফুলে ঢেউয়ের নাচন,
সরিষার হলুদ মাঠ– ছন্দে মাতাল
দেখি না কতদিন।
কতদিন পাইনি চাঁপার ঘ্রাণ
দেখিনি শিউলীর জাফরানি বোঁটা
ডালিয়ার টকটকে লাল রং।
শুনিনি কোকিলের কুহু ডাক
ময়নার কেমন আছো' সম্ভাষণ।
হলদে পাখি আর বৌ কথা কও
কোথায় ওরা?
আমি খুঁজি সারাক্ষণ।
ঘুঘু ডাকা সেই নিদাঘ দুপুর
কুয়াশায় চাদর জড়ানো বিকেল কোথায়?
কত কী খুঁজি
খুঁজতে খুঁজতে বিকেল গড়িয়ে রাত নামে।
রাত গভীর হয় ক্রমান্বয়ে
চোখে ঘুম নেই,
আরামের ঘুমটুকুও পলাতক
চারদিকে আলোর বন্যায়।

একাত্তর ও আমি

নিভা বিশ্বাস
সহকারী শিক্ষিকা

একাত্তরে আমার বয়স ছিল মাত্র আড়াই বছর। তখন বোঝার শক্তি আমার পুরোপুরি হয়নি। কীভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো তা বড় হয়ে আমার মায়ের নিকট থেকে জেনেছি। কীভাবে পালিয়ে ভারতে যাই তাও আমার মায়ের মুখ থেকে শুনেছি। তখনকার ঘটনা আমার মনে অস্পষ্ট হয়ে আছে। আমাদের দেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে ছিলাম। তারা আমাদের শাসন ও শোষণ করতো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাদের নির্যাতন করতো। একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে তারা এদেশের মানুষের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে বিভিন্ন পেশার লাখো মানুষ শহীদ হন। সারাদেশে তারা হত্যা, নির্যাতন, জ্বালাও-পোড়াও শুরু করে। মানুষ বাঁচার জন্য বিলে, পাটক্ষেতে, ধানক্ষেতে, ডোবা কচুরিপানার ভেতর, বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। আমরাও এরকম জায়গায় আশ্রয় নিই।

পাক মিলিটারিরা যখন আমাদের বাসা ও দোকানঘরগুলো পুড়িয়ে দেয়, তখন আমরা আমার মাসির বাড়িতে আশ্রয় নিই, কারণ বাড়িটি ছিল বিলের ভেতর। আমরা থাকতাম বাজারে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে মিলিটারি আসছে– এ সংবাদ শুনে আমার ঠাকুরমা অসুস্থ হয়ে যান এবং পরে মৃত্যুবরণ করেন। হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের অত্যাচারে জীবন রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের মাত্রা সীমার বাইরে চলে যায়। এ অবস্থায় আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিসহ বাবা মধ্য আষাঢ়ের দিকে ভারত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হেঁটে ভারতের দিকে রওনা হন। হেঁটে ভারতে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো পথ ছিল না। তখন যানবাহন তো ছিলই না। যে পথে মিলিটারির যাতায়াত কম সে পথেই সকলে রওনা দেন। আষাঢ় মাস থাকার কারণে পথে প্রচুর পানি ও কাদা ছিল। বাবার কোলে ছিলাম আমি, হাতে ছিল একটি হারিকেন ও একটি ভারী ব্যাগ। বাবা খুব কষ্ট করে হাঁটছিল। এক সময় পা পিছলে পড়ে গিয়ে ব্যথা পান। এরপর আর আমাকে নিতে পারেননি। আমাদের এক প্রতিবেশী আমাকে কোলে করে ভারত পর্যন্ত নিয়ে যান। বাবার পড়ে যাওয়ার ঘটনা আজও আমার মনের গভীরে স্মৃতি হয়ে আছে, যা আমাকে এখনো কষ্ট দেয়।

আমার একটি ছোট বোন ছিল, এ জন্য মা আমাকে কোলে করে নিতে পারেননি। বাবার পিছে পিছে হাঁটত আমার দুই ভাই। আমার দিদিমার হাঁটতে কষ্ট হতো, তাই দুই মামা বাঁশের তৈরি একটি বাঁকে করে তাঁকে বহন করেন। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় গুড়, চিড়া খেয়ে হাঁটা শুরু করতাম। দুপুর ২টা পর্যন্ত হাঁটতাম, পথে কোনো স্কুল-কলেজ বা খোলা মাঠ থাকলে সেখানে অবস্থান নিতাম। হাঁটতে হাঁটতে পা ফুলে যেত। মা কষ্ট করে ভর্তা জাতীয় যা রান্না করতেন, আমরা সবাই মিলে তা খেতাম। বেশি সমস্যা হতো ছোটবোন ও আমার। আমাদের জন্য কোনো খাদ্য ছিল না। ছোটবোন দুধ খেত কিন্তু তা ছিল দুর্লভ।

মধুমতী নদী নৌকায় করে পার হয়েছি কিন্তু খরস্রোতা কপোতাক্ষ নদ সাঁতরিয়ে পার হয়েছেন বড়রা। আমি, ছোট বোন ও ব্যাগগুলো পার করা হয়েছিল কচুরিপানার তৈরি ভাসমান গুটায় করে।

পথে শান্তি কমিটির লোকজন লুটপাট করতো। একদিন মিলিটারি ভারতগামী লোকজনের ওপর হামলা চালায়। আমরা সকলে দল ছাড়া হয়ে পড়ি। পরিস্থিতি শান্ত হলে বাবা আবার সকলকে খুঁজে আনেন। সারাদিন রোদের মধ্য দিয়ে হাঁটতে সকলের শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। সকলে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। আমার ছোট বোনের হঠাৎ ডায়রিয়া হয়। পথেই তার মৃত্যু হয়। সন্তানের মৃত্যু মা-বাবার জন্য কত বেদনাদায়ক, কত কষ্টের তা শুধু স্রষ্টাই জানেন। কষ্ট সইতে না পেরে মা-বাবা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর পর দিন আমরা ভারতে পৌঁছাই। ভারতে পৌঁছাতে আমাদের সময় লাগে সাত দিন।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হেলেঞ্চা বর্ডার দিয়ে আমরা ভারতে প্রবেশ করি। ভারতীয় সেনারা আমাদের গ্রহণ করেন। তারা আমাদের সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রত্যেককে ভ্যাকসিন দেন। পরিবারের লোকসংখ্যা জেনে প্রত্যেক পরিবারকে একটি বর্ডার স্লিপ দেন প্রমাণ স্বরূপ। আমরা শরণার্থী হয়ে যাই। আমরা প্রথমে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠি। সেখানে একমাস থাকার পর মামাদের সঙ্গে কলকাতার উল্টাডাঙ্গার নিকট সল্ট লেক ক্যাম্পে যাই। সেখানে বর্ডার স্লিপ জমা নিয়ে একটা কার্ড দেন। আমাদের থাকার জন্য আড়াই রুমের একটি ঘর দেন। বাবা ঐ কার্ড দেখিয়ে প্রতি সপ্তাহে চাল, ডাল, পেঁয়াজ, হলুদ, তরকারি ও জ্বালানি কাঠ তুলে আনতেন। সকালে খাবার জন্য ক্যাম্প থেকে আমাদের মিষ্টি পাউরুটি দেয়া হতো। ক্যাম্পে থাকা-খাওয়ার কোনো সমস্যা হয়নি। সারা ভারতে ট্রেনে চলাচলের জন্য আমাদের কোনো টিকিট লাগতো না।

ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর আমাদের মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী একত্রে পাকহানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের নয় মাসের শ্রম সার্থক হয়। আমরা বিজয় অর্জন করি। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিই। ক্যাম্পে আমরা বিজয় উৎসব পালন করি। এবার ঘরে ফেরার পালা। 'ক্যাম্প থেকে যাত্রীবাহী একটি ট্রাকে আমাদের পরিবারকে খুলনা শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেন। খুলনা থেকে একটি নৌকায় করে আমরা আমাদের বাড়িতে ফিরে আসি। বাড়ি ফিরে দেখি ঘর ও দোকানগুলোর বাকি যে অংশ ছিল তাও লুটেরা লুট করেছে। আমরা একটি তাঁবু টাঙ্গিয়ে কয়েকমাস এর মধ্যে বসবাস করি। লুটেরা আমাদের সবকিছু লুট করেছিল কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা লুট করতে পারেনি। আজ আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে গর্বিত।

মাকে মনে পড়ে

মোছাঃ এলিজা খাতুন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

দুরন্ত সেই ছেলেবেলা আমার মনে পড়ে
ছুটির দিনে ভর দুপুরে যেতাম ছুটে চলে,
কখনও মাছ ধরতে ঐ ছোট্ট বিলের ধারে
আবার যেতাম গ্রীষ্মকালে আম কুড়াতে মাঠে।
বকতো মায়ে আদর ভরা রাঙা দুটি চোখে।
রাগ ফুরালে আম মাখিয়ে খেতাম সবাই মিলে;
মাছ দেখেও হাসতো মা- কাজ ফুরালে শেষে
বলতো এখন পড়তে বসো লক্ষ্মী সোনা বলে।
সেই মামণি এখন আমার বিছানায় শুধু শুয়ে
বকেনা আর রাগটি কোরে শান্ত ঐ চোখে,
তবুও ভালো মা জননী আছে মোদের কাছে
পারে না খেতে নিজের হাতে বড়ই কষ্ট লাগে।
এমন মায়ের শিয়র হতে কেমনে দূরে যাই
সদাই ভাবি কখন আমার মা যে চলে যায়,
মায়ের ভাবনা শেষ হয়েছে আমার কাঁধে দিয়ে
দায়িত্ব ভরা আমার জীবন চলছে খুঁড়ে খুঁড়ে।
ভাই-বোনদের মাঝেই আমি মাকে দেখতে পাই
তাইতো আমি তাদের ডাকে ছুটে চলে যাই,
যখন তুমি সেথায় থাকো দোয়া আমার করো
তোমার দেয়া কাজ যেন মা করি খুশি মনে।

ছড়া

মোছাঃ এলিজা খাতুন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

ঐ যে দেখ আসছে সে যে
নতুন সাজে নববধূর বেশে;
নব তুমি, সালাম কর
মাঠের দুর্বা ঘাসে,
প্রতি বর্ষে আস নিয়ে
রং বেরঙের সাজ
ভোলে কৃষক, শিশুর প্রাণে
খেলাধুলায় নাচ॥

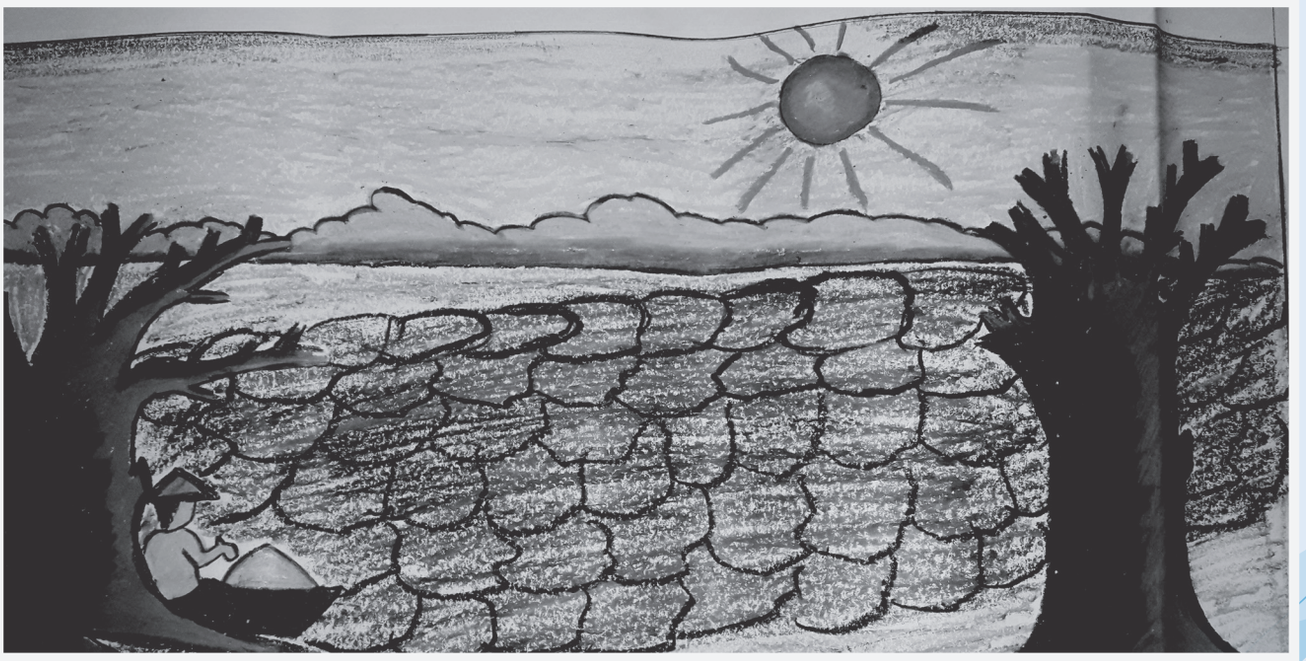

অংকিতা রায়, ষষ্ঠ শ্রেণি, ক-শাখা, রোল : ০৪

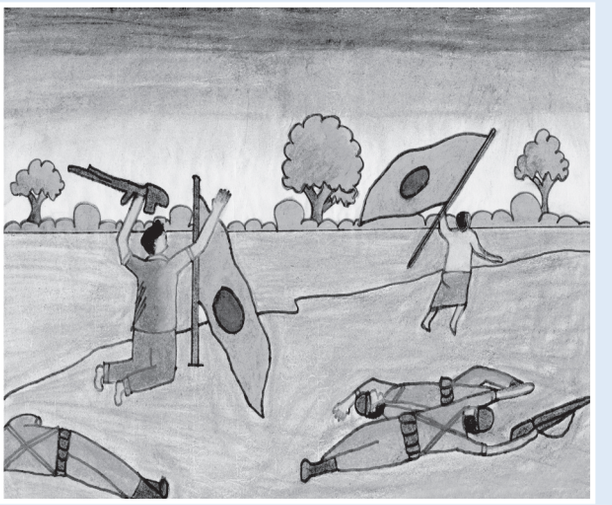

সুজানা আহম্মেদ, অষ্টম শ্রেণি, খ-শাখা, রোল : ৩৮

অধরা নন্দী, অষ্টম শ্রেণি, খ-শাখা, রোল : ২৭

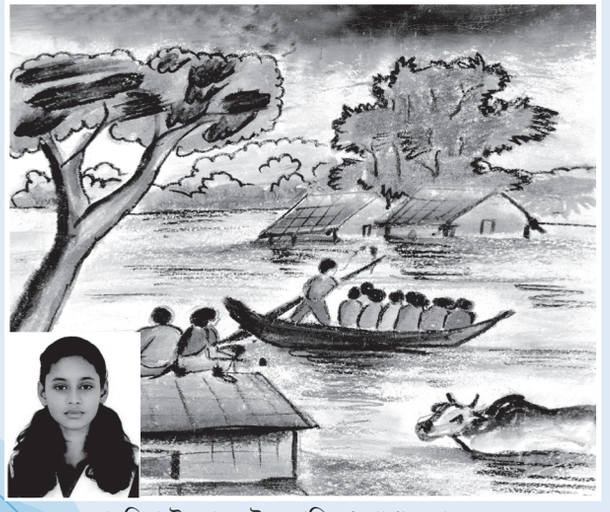

ফাহমিদা ইলমা, অষ্টম শ্রেণি, খ-শাখা, রোল : ০৮

আরিফা খানম অহনা, তৃতীয় শ্রেণি, ক-শাখা, রোল : ০৪

উত্তরণ

২০১৯